গুরুপ্রণতি

গুরুরূপে প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী

প্রব্রাজিকা ধ্যানপ্রাণা

ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐতিহ্যে গুরুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়, গুরু ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না। 'গুরু' শব্দটি নিষ্পন্ন 'গৃ' ধাতু থেকে। ধাতুটি বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক—দূর করা বা নিরসন করা, গ্রাস বা নিঃশেষ করা ইত্যাদি। অর্থাৎ গুরু শিষ্যের অবিদ্যা নিরসন বা নিঃশেষ করেন। 'গৃ' ধাতুর আর-একটি অর্থ উপদেশ বা শিক্ষা দেওয়া। শিষ্য নিজের অবিদ্যাকে কীভাবে তিরোহিত করবেন বা কেমন করে মায়ামুক্ত হবেন সেই বিষয়ে গুরু শিষ্যকে উপদেশ বা শিক্ষা দেন। বিশ্বসারতন্ত্রের অন্তর্গত গুরুগীতায় শিব পার্বতীকে বলছেন—

''গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥''

—'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, 'রু' শব্দের অর্থ দূর করা। যিনি শিষ্যের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে দূর করে দেন তিনিই গুরু নামে অভিহিত।

'শিষ্য' শব্দটিও নিষ্পন্ন হয়েছে সংস্কৃত 'শাস্' ধাতু থেকে, যার অর্থ শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ শিষ্য সে-ই, গুরু যাকে শাসন বা নিয়ন্ত্রণাদির মাধ্যমে পরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় সঞ্চারিত হয়, তাহাকে 'শিষ্য' বলে।'' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে গুরু যেন ঘটক। তিনিই মধ্যস্থ হয়ে ইষ্টের সঙ্গে শিষ্যের যোগাযোগ ঘটান।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গুরুপরম্পরা সম্পর্কে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজ এক ব্রহ্মচারীকে লিখেছিলেন, ''শ্রীভগবানের মানসপুত্র ব্রহ্মা। তাঁহার মানস সৃষ্টি সনক-সনন্দন-সনৎকুমার-সনাতন। তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরায় ব্যাস। তৎপুত্র শুকদেব। শুকদেবের ব্রহ্মবিদ্যাবংশে জন্মায় গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ। গোবিন্দপাদের সন্তান শঙ্করাচার্য। তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় তোতাপুরী, তাঁহার শিষ্য রামকৃষ্ণপুরী, তাঁহার মানসপুত্র ...পুরী, তাঁহার শিষ্য ...পুরী, তাঁহার শিষ্য, মানসপুত্র আমি ব্রহ্মচারী ...শর্মা।''[৩] এইভাবে গুরুপরম্পরায় একই গুরুশক্তি সাধককে পরম লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। এই প্রবন্ধে আমরা দেখব, শ্রীসারদা মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজীর মধ্য দিয়ে কীভাবে এই মহান গুরুশক্তি প্রবাহিত হয়েছিল।

১৯৭৩ এর ৩০ জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্যা তথা সেবিকা শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা

পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর মহাসমাধির পর প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী সঙ্ঘনেত্রী পদে বৃত হন। ওই বছর ১০ এপ্রিল অন্নপূর্ণাপূজার পুণ্যতিথিতে তিনি অধ্যক্ষার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৫০ সালে নিবেদিতা স্কুলে থাকাকালীন মোক্ষপ্রাণামাতাজী যখন ব্রহ্মচারিণী রেণু, তখনই তাঁকে মহাশক্তির আধাররূপে দেখেছিলেন স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজ। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, নিবেদিতা স্কুলে এক মহাশক্তিময়ী ব্রহ্মচারিণীকে দেখেছেন—নাম রেণু। তাঁকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে, এইবার মেয়েরা উঠবে। সারগাছি থেকে তাঁকে তিনি লেখেন (১৭.৪.৫৩), ''মা, তোমার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তহীন কৃপা দেখিয়া আমরা তোমাকে এত স্নেহ করি।... তোমাকে দেখিবামাত্র আমার মনে এমন আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তুমি আমাদের বহুবাঞ্ছিত নারী-জাগরণ ব্রত উদ্‌যাপন করিবে...।''

শ্যামলাতাল থেকে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ রেণুকে লিখেছিলেন (৬.১০.৪৮), ''তোমার নির্ভীক আদর্শনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ কর্মতৎপরতা এবং অমায়িক মধুর চরিত্রের বিষয় জেনে স্বভাবতই তোমার উপর স্নেহসম্পন্ন হয়েছি। শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর কাজে তুমি জীবন উৎসর্গ করেছ। প্রার্থনা করি তাঁরা সর্বতোভাবে তোমার পথের সহায় হোন।'' পূজ্যপাদ মহারাজদের আশীর্বাদ ও প্রেরণাকে পাথেয় করে রেণুর ত্যাগব্রতী জীবনের পথ চলা শুরু, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল সঙ্ঘগুরুরূপে তাঁর মহান ভূমিকা পালনে। জাতিধর্মনির্বিশেষে জ্ঞানীগুণী, ধনী-নির্ধন, দেশ-বিদেশের নারীপুরুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে ঋদ্ধ হয়েছিলেন, আশ্রয় পেয়েছিলেন।

মঠের আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিভাগ—ঠাকুরঘর, ভাণ্ডার, বাগান, গোশালা, ভক্তসেবা—সবদিকে ছিল মাতাজীর সতর্ক দৃষ্টি। ঠাকুরসেবার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর দিব্য উপস্থিতি সর্বদা অনুভব করে ঠাকুরসেবা করতে বলতেন। একটি ছোট ঘটনা। তখন শীতকাল। মন্দিরে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর গলায় মালা ও তাঁদের চারিদিকে ফুল দিয়ে ফুলদানি সাজিয়ে রাখা আছে দেখে মাতাজী বললেন, ''এইরকম ঠান্ডায় আমাদের যদি মালা পরিয়ে, ফুলদানিতে জলের মধ্যে ফুল দিয়ে চারপাশে রাখা হত তাহলে আমাদের কেমন লাগত? এসব কথা ভাবতে হয়।''

সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের জীবন গঠনে মাতাজী সর্বদা তৎপর ছিলেন। তাঁর নিজের জীবন ছিল সুনিয়ন্ত্রিত এবং সম্পূর্ণ অধ্যাত্মনিষ্ঠ। ১৯৩৫ সালের পুণ্য রামনবমী তিথিতে বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। সেদিন দীক্ষান্তে মহারাজ মাতাজীকে বলেছিলেন, ''আজ থেকে তোমার আর কেউ নেই, শুধু ঠাকুর ও মা।'' সেই দিনটি থেকে শ্রীগুরুর উপদেশকে পাথেয় করে তাঁর পথ চলা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন দিব্যত্রয়ী। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন—তাঁরা তিনে এক, একে তিন। তাঁর মুখে একথা খুবই শোনা যেত—''যদি খুঁটি ঠিক দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা যায় তাহলে বেচালে পা পড়ে না, পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।'' আর বলতেন, ''ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরে বিশ্বাস—এই ত্রিশূল ধরে এগিয়ে চলো। কোনও ভয় নেই।''

সাধকজীবন সম্বন্ধে মাতাজী বলতেন, ''ঈশ্বরে বিশ্বাস ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস, যথাসাধ্য বিষয়সম্পর্ক ত্যাগ, আহার-বিহারে সংযম, অসৎ প্রসঙ্গ না করা, সৎসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, সৎচিন্তা, সদসদ্‌বিচার, জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি লক্ষ রাখা, অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়, নিরভিমানিতা, স্বার্থত্যাগ, নির্লিপ্তি,

ভগবানই সারসত্য—এই বোধ, অভ্যাসযোগ''—এইগুলি দরকার। সর্বোপরি মনে করিয়ে দিতেন, ''নিজের মনকে ভাল করে চিনতে হবে। সত্যকার ভালবাসার পরখ হল ত্যাগের প্রবৃত্তিতে। যে ভালবাসায় যত বেশি কল্যাণবুদ্ধি যত আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি, ত্যাগের প্রবৃত্তি আপনা থেকেই গভীরতর আর দৃঢ়তর হতে থাকে, সেই ভালবাসাই খাঁটি জাতের।''

নিয়মিত জপধ্যানের ওপর মাতাজী খুব জোর দিতেন। নিজে দুবেলা গর্ভমন্দিরে এক কোণে বসে জপ করতেন। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী, বিশেষ বিশেষ তিথিতে এবং শনি-মঙ্গলবারে বেশি করে জপ করতে বলতেন। মহানিশায় জপ করতেও উৎসাহিত করতেন, তবে রুটিনের কাজকর্মের ক্ষতি করে নয়। জপের সময় ও স্থান নির্দিষ্ট রাখতে বলতেন। বলতেন, ''খুব জপ করবে। মন্ত্র কি যে সে জিনিস? মন্ত্র শরীরে গেঁথে যায়। জপ মানে কী জান? জপ মানে তুমি যতবার মায়ের নাম উচ্চারণ করছ, তা ঠোঁট বন্ধ করেও হতে পারে, তুমি জিভ দিয়ে মাকে স্পর্শ করছ। যত জপ করবে, তত মায়ের স্পর্শ পাবে। মনের বাজে খরচ কোরো না। ইষ্টবস্তু চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা মানেই মনের বাজে খরচ। ইষ্টবস্তুকে ভালবাসতে না পারলেও তেতো ওষুধ গেলার মতো জপ করে যেতে হয়। প্রতিদিন নিষ্ঠাসহকারে একভাবে জপধ্যান করাটাই প্রমাণ যে ঠিক ঠিক হচ্ছে। নিজের নিয়মনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হওয়া মানে ঠিক ঠিক হচ্ছে না। নিয়মিত করতে পারা মানে তিনি সঙ্গে সঙ্গে থেকে করিয়ে নিচ্ছেন—তাঁর ওপর নির্ভরতা, বিশ্বাস আসছে। গুরু মহামন্ত্র কানে দেন। শিষ্য বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম ভালবাসা দিয়ে সেটাকে যদি পোষণ না করে, মন্ত্রকে যদি না জাগায় তাহলে তার ফল পাবে কেমন করে? গুরু হলেন সচ্চিদানন্দ শিব—তিনি মস্তকে থাকেন—সামনে বসে সেই পরমানন্দময় শিবের ধ্যান করে নেবে। তারপর যিনি মন্ত্র দেন তাঁকে একটি প্রণাম জানাবে।... তারপর শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি নিয়ে জপ করবে।''

কেউ জানতে চেয়েছেন অস্থির মন কীভাবে স্থির হবে। মাতাজী সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন : ''জপে মন বসছে না বলে এত অস্থির হোয়ো না। মনকে এতদিন যেসব চিন্তায় অভ্যস্ত থাকতে দিয়েছ দুদিনের চেষ্টায় কি সে তার অভ্যস্ত চিন্তা ছাড়তে পারে? এ কখনই সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক পথ অত্যন্ত কঠিন। এ-পথে এগোতে হলে চাই গুরু ও ইষ্টের ওপর অটল বিশ্বাস ও অপরিসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়। মন স্বভাবতই চঞ্চল, ক্রমাগত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই এই চঞ্চল মনকে ইষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট রাখা সম্ভব। জপে মন বসতে না চাইলেও জোর করে মনকে ইষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট করার চেষ্টা করবে। জপ করতে বসে একান্তভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবে, যেন তিনি কৃপা করে তোমার মনকে স্থির করে দেন। তোমার চেষ্টা আন্তরিক হলে তিনি কৃপা করবেনই।

জপ করার সময় একটা মন দিয়ে জপ করবে, আর একটা মন দিয়ে মনের গতিবিধি লক্ষ করবে। ভিতর ভিতর শান্ত, ধীরস্থির থেকে প্রশান্ত মনে জপ করে চলার চেষ্টা করবে। এভাবে যদি করে যেতে পার, ধীরে ধীরে ঠিকই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। তুমি যে-মন্ত্র পেয়েছ, তাতেই তোমার ভক্তি ও মুক্তি—এই কথা মনে মনে বিশ্বাস করো।"

তিনি যে মায়ের শক্তিতে শক্তিময়ী, তা বহু ঘটনায় প্রকাশ পেত। একবার এক ব্রহ্মচারিণী মঠে নাটমন্দিরে জপ করতে বসেছেন। মশার উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত, তাই ভাবছেন ওডোমস মেখে বসলে ভাল হত। পরদিন মাতাজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হতেই মাতাজী বললেন, ''জপ করার সময় মনের গভীরে ডুবে গিয়ে জপ করতে হবে। বসে বসে মশার তেলের কথা চিন্তা করলে কিছু হবে না।"

একবার এক শিষ্যার মনে সংশয় দেখা দিল—মাতাজীর শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে কেন? তাঁকে প্রণাম করেই তো সবাই পবিত্র হবে! একদিন তিনি মাতাজীকে প্রণাম করতে গেছেন কিন্তু নিজের ওই সংশয়ের কথা প্রকাশ করেননি। তাঁকে দেখেই মাতাজী বলে উঠলেন—''দ্যাখ, আগে আমিও এসব বিশ্বাস করতাম না। কেউ স্পর্শ করে প্রণাম করেছে, ঠাকুরের পায়ে গায়ে অসহ্য জ্বালা হয়েছে। ভাবতাম এরকম আবার হয় নাকি? কিন্তু এখন বুঝি, সত্যি হয় রে, কেউ কেউ স্পর্শ করে প্রণাম করলে জ্বালা হয়, শরীরে খুব কষ্ট হয়।" মাতাজীর কথায় শিষ্যা বাক্‌রুদ্ধ।

একবার মাতাজী দিল্লি আশ্রমে গেছেন। মাতাজীর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে নিষেধ করা হয়েছে। মাতাজীর এক শিষ্যা চিকিৎসক। দিল্লিতে থাকাকালীন মাতাজীর ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদি দেখবার ভার দিল্লি কেন্দ্রের তৎকালীন সম্পাদিকা মাতাজী তাঁকে দিয়েছেন। যখন তাঁর প্রণাম করার পালা এল তখন তিনি মাতাজীর কাছেই পাদস্পর্শ করার অনুমতি চাইলেন। মাতাজীর প্রত্যুত্তর—''সকলে যখন মানা করছেন তখন থাক।" শিষ্যার মনে খুব দুঃখ হল। বাড়িতে ফিরে নিজের মাকে অনুযোগের সুরে বললেন, ''তুমি বল, গুরু শিষ্যের সব বুঝতে পারেন। সব ভুল। তিনি যদি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তবে পায়ে কেন হাত দিতে দিলেন না?" মন ভারাক্রান্ত। রাত্রিবেলা আশ্রম থেকে সম্পাদিকা মাতাজী ফোনে তাঁকে জানালেন যে মাতাজী পরদিন কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। তিনি যেন সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে আশ্রমে এসে মাতাজীর সঙ্গে দেখা করেন। যথাসময়ে মাতাজীর সামনে উপস্থিত হলে তাঁকে অবাক করে মাতাজী বললেন, ''নাও কত প্রণাম করবে করো। প্রাণভরে প্রণাম করে নাও, মনের কোনও বাসনা অপূর্ণ রাখতে নেই।"

মাতাজীর এক অবিবাহিত সন্তান দক্ষিণেশ্বরের দোলপিঁড়িতে একটি ছোট গহনার দোকানের মালিক। কাছে থাকতেন বলে প্রায়ই বিকেলের দিকে মঠে আসতেন। বয়স সাতাশ-আঠাশ বছর। মাতাজী সপ্তাহে একদিন ভক্তছেলেদের জন্য সময় নির্দিষ্ট রেখেছিলেন। কোনও গ্রন্থ থেকে পড়তেন, আলোচনা করতেন। সেইসময় মাতাজী তাঁদের কাছে 'তপোভূমি নর্মদা' পড়ছিলেন। মাতাজীর মুখে নর্মদা মায়ের মাহাত্ম্য শুনে নর্মদাতীর্থের প্রতি সেই সন্তান এমনই আকর্ষণ বোধ করলেন যে মাতাজীর অনুমতি নিয়ে দোকানের ভার কর্মচারীর ওপর দিয়ে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। মাতাজীর নির্দেশ মেনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সংবাদ সহ পোস্টকার্ডও এসেছিল তাঁর। কিন্তু তারপর গুরুর সঙ্গে বাহ্যিক আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। গুরুর আশীর্বাদ ও নর্মদামায়ের কৃপায় নিশ্চয়ই সার্থক হয়েছিল তাঁর ওই অধ্যাত্ম অভিযান।

মাতাজী একবার কথাপ্রসঙ্গে এক শিষ্যাকে

বলেছিলেন, ''গুরু ধরে না রাখলে এগোনো যায় না। গুরু সর্বদা শিষ্যকে ধরে রাখেন। যখনই গুরু একজনকে শিষ্য বলে গ্রহণ করেন তখন থেকেই তিনি তাঁর সব ভার নেন—গুরু কখনও তাকে ছেড়ে দেন না।'' শিষ্যার প্রশ্ন—''গুরুর শরীর চলে গেলেও সেটা থাকবে তো?'' মাতাজী দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, ''নিশ্চয়ই। এ তো মানুষের শক্তি নয়, এ হল গুরুশক্তি, পরমগুরু ভগবানের শক্তি।''

মাতাজী যেমন বহু দীক্ষাপ্রার্থীর আর্তি দেখে তাদের কৃপা করেছেন, তেমনই আবার অনেকে অযাচিতভাবে তাঁর কৃপা পেয়েছেন। এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে। একবার এক ভদ্রমহিলা দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন কলকাতার বাইরে থেকে। প্রথমে মাতাজী নানা কারণে তাঁকে দীক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু বারবার অনুরুদ্ধ হওয়ায় মাতাজী শেষ পর্যন্ত দীক্ষা দিতে সম্মত হন। মাতাজীর কাছেই শুনেছিলাম, দীক্ষার সময় কিছুতেই তিনি তাঁকে মহামন্ত্র দিতে পারেননি। অগত্যা তাঁকে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নাম জপ করতে বলেন। গুরুকৃপা ধারণ করার জন্য শিষ্যেরও যে প্রস্তুতি প্রয়োজন!

স্বামীর অকালমৃত্যুতে শোকসন্তপ্তা এক ভদ্রমহিলাকে তাঁর এক প্রতিবেশিনী (মোক্ষপ্রাণা-মাতাজীর শিষ্যা) শ্রীসারদা মঠ ও মাতাজীর কথা জানান। একদিন ভোরবেলা স্বপ্নে ওই মহিলাকে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন ও মন্ত্র দেন। তাতে তাঁর মন আরও উদ্বেল হয়ে উঠল। হঠাৎ একদিন তিনি সারদা মঠে উপস্থিত হলেন। মাতাজীর কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মাতাজী তাঁকে শান্ত করে নির্দিষ্ট দিনে দীক্ষার জন্য আসতে বললেন। দীক্ষার সময় মাতাজী তাঁকে একটি মন্ত্র শুনিয়ে বললেন, ''তুমি এই মন্ত্র জপ করবে, তুমি তো স্বপ্নে এই মন্ত্রই পেয়েছ!'' শিষ্যা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনি কী করে জানলেন?'' মাতাজীর প্রত্যুত্তর—''কি করে জানলুম বলতে পারব না, তুমি ওই মন্ত্রই জপ করো।''

মাতাজী ছিলেন প্রকৃতিতে গম্ভীর, মিতভাষী। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে এমন একটা মাধুর্য, অমায়িকতা ও নিরভিমানিতা ছিল যে সহজেই সকলে তাঁর কাছে নিঃসংকোচে নিজের সমস্যা জানাতে পারত। কেবল তাঁর দীক্ষিত সন্তান নয়, যে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে তাকেই তিনি আপন করে নিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, ''গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নেই। গুরু ও ইষ্ট অভেদ।'' প্রাণতোষিণী-তন্ত্রে বলা হয়েছে, গুরুতে মানুষবুদ্ধি করলে শতকোটি কল্প সিদ্ধিলাভের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমরা সাধারণ মানুষ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুর বিচার করি। একবার মাতাজীর এক শিষ্যা গুরুকৃপাবলে মাতাজীর কিছু সেবাধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু মাতাজীর সান্নিধ্যে অন্য কেউ এলে তার মনে হিংসার উদ্রেক হত। ফলে অনেকসময় মাতাজীর সঙ্গে তার ব্যবহারেও মনের ক্ষোভ প্রকাশ পেতে লাগল। মাতাজী তা লক্ষ করলেন। তাকে কয়েকদিন আসতে বারণ করলেন। নিজদোষে সে গুরুর সেবাধিকার থেকে বঞ্চিত হল। কিন্তু সে বাড়িতে শান্তিতে থাকতে পারছে না, রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। এদিকে মাতাজীও তার শুভবুদ্ধি জাগরণের জন্য অবিরাম শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করে চলেছেন। কয়েকদিন পরই গুরুকৃপায় তার মনে পরিবর্তন এল। কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে গুরুর পদপ্রান্তে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করল। গুরুকৃপায় মেয়েটি রক্ষা পেল। বলা হয়েছে, ''শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন''—শিব রুষ্ট হলে গুরু শিষ্যকে রক্ষা করেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে শিষ্যকে কেউ রক্ষা করতে পারে না।

সাধনপ্রসঙ্গে মাতাজী বলতেন, ''মন্ত্র হল ভগবানের সূক্ষ্মশরীর। ছবি তাঁর স্থূল শরীর। শ্রীশ্রীমাও বলেছেন, ছায়া-কায়া সমান। ঠিকমতো

জপ করতে হবে। যতটুকু সময়ই বস না কেন ততটুকু সময় যেন ইষ্টের চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তা না থাকে। নামে রুচি, অনুরাগ ছাড়া জপ আলুনি লাগে। নাম জপ করতে করতে মন নির্মল হয়। নাম নিতে নিতে হবে অনুরাগ, ক্রমে হবে বিষয়ে বিরাগ, ক্রমে কুণ্ডলিনী হবে সজাগ। যদি মন্ত্র ঠিকমতো জপ না কর তাহলে গুরুর শরীর খারাপ হয়ে যায়। যদি নিজের জন্য জপ করতে ভাল না লাগে, তবুও গুরুর শরীর ভাল থাকবে— একথা ভেবে জপ করে যেতে হবে। আজকালকার দিনে ছেলেমেয়েরা একথা বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু এ সত্যি।"

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরুরা নিজেদের কখনই 'গুরু' বলে মনে করেন না। তাঁরা নিজেদের শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদা দেবীর সাধনধারার ধারক ও বাহক বলেই মনে করেন। এক শিষ্য পত্রে জানায় যে, মাতাজী যদিও ঠাকুর ও মায়ের ধ্যান করার কথা বলেন কিন্তু তার পক্ষে মাতাজীর ধ্যান করা সহজ বলে মনে হয়। উত্তরে মাতাজী জানান— ''দেখো, সচ্চিদানন্দই গুরু। তিনি ছাড়া অন্য কেউ গুরু হতে পারে না। তাই ধ্যান করার সময় শ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের ধ্যান করার কথা বলেছি। তবে তোমার যদি মনে হয় শ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের ধ্যানের চাইতে আমার ধ্যান করলে তুমি বেশি উপকৃত হচ্ছ, বেশি লাভবান হচ্ছ, তাহলে তা করতে পার। কারণ শ্রীঠাকুর বলতেন, কারও ভাব নষ্ট করতে নেই। আমার কিন্তু একটা কথা মনে হয়, বাবা। তাঁদের ভাগবতী তনু। সেই ভাগবতী তনুর ধ্যান করলে, চিন্তা করলে তাঁদের যে সদ্‌গুণরাজি তা তোমার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবে। আমি সাধারণ মানুষ। এ মানুষ-দেহের চিন্তা বা ধ্যান তোমায় হয়তো অত উপকৃত করবে না।... আসল কথা হল আনন্দ পাওয়া।" একটি চিঠিতে মাতাজী লিখেছিলেন, ''আমাকে যেমন ভালবাস, তেমনই মাকে ভালবাসবে। শ্রীশ্রীমাকে ধরো, তাঁকে ভালবাসো— দেখবে তিনি তোমার মনে কেমন জেগে উঠেছেন। আমাদের জীবন তো শুধু ঈশ্বরসান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। আর কিছু চাওয়ারও নেই, পাওয়ারও নেই।"

মাতাজী কয়েকটি বাক্যে অতি সহজে জীবন ও সাধনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিয়ে দিতেন : ''যদি শান্তি চাও সংসারে তোমার যার প্রতি যে-কর্তব্য রয়েছে তা নিষ্ঠা সহকারে পালন করো। কিন্তু কারও কাছে কোনও প্রত্যাশা রেখো না। জীবনকে যদি মধুময় করে তুলতে চাও, তবে জপধ্যানের দ্বারা মনের গভীরে ঢুকতে হবে। ভাসা ভাসা জপ করলে চলবে না।... জপের ক্ষেত্রে নিয়ম, নিষ্ঠা, ক্ষণ খুব দরকার। সময় ঠিক করে জপ করলে ধীরে ধীরে মন বসে। সময়মতো বসতে পারলাম না বলে মন খারাপ হয়। ক্ষণরক্ষা করতে হবেই।"

অনেকেরই ধারণা সাক্ষাৎ গুরুসেবা করতে না পারলে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে মাতাজীর অভিমত—''গুরুর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করা সবসময় সম্ভব নয়। তাই শ্রীগুরুনির্দেশিত পথে ঠিকমতো চলার চেষ্টা করলে এবং শ্রীগুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র নিষ্ঠা ও ভালবাসার সঙ্গে জপ করলেই শ্রীগুরুর যথার্থ সেবা করা হয়। গুরুকৃপা তাঁর সকল শিষ্যের ওপর একইরকম থাকে। কিন্তু শিষ্যকে জপধ্যান ও গুরুভক্তির দ্বারা সেই কৃপা ধারণা করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।" মাতাজীর এই কথাগুলি পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছিল তাঁর দিব্যজীবনে। তাঁর গুরু স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পুণ্যদর্শন জীবনে তিনি মাত্র দুবার পেয়েছিলেন। এই স্বল্পকালীন গুরুসঙ্গ তাঁর আধ্যাত্মিক অগ্রগতিকে কখনই ব্যাহত করেনি বরং গুরুকৃপায় তাঁর মধ্যে গুরুশক্তির সার্থক বিকাশ হয়েছিল। গুরু তাঁর হৃদয়ে যে-মন্ত্রবীজ রোপণ করেছিলেন, গুরুকৃপাবলে তা পরিণত হয়েছিল এক বিশাল মহীরুহে, যা হাজার হাজার মানুষকে দিয়েছে পরম আশ্রয়।